কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া বা কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ধানের পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা: নিবিড় চাষাবাদের ফলে প্রধান খাদ্য শস্য ধানে পোকার প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগের গবেষনায় ধান ক্ষেতে ২৩২ প্রজাতির ক্ষতিকর পোকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ২০-৩৩ প্রজাতির পোকা ধানের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকে। আবার এ সমস্ত ক্ষতিকর পোকার পরজীবি হিসেবে ১৮৩টি এবং পরভোজী হিসেবে ১৯২টি সহ সর্বমোট ৩৭৫টি উপকারী পোকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই উপকারী পোকাগুলো ক্ষতিকর পোকার ডিম বা কীড়ার উপর ডিম দিয়ে কিংবা তাদের বাচ্চা, পুত্তলী ও পূর্ণবয়স্ক পোকাকে সরাসরি খেয়ে ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির মাত্রাকে অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তের নীচে রাখতে সক্ষম হয়। যদি ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা বা ক্ষতির প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তাহলেই কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অনাকাঙ্খিতভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক ধানের চারা রোপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যেই ইউরিয়া সারের প্রথম উপরি প্রয়োগের সময়েই দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন। যদিও সে সময়ে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ খুব একটা দেখা যায় না। ধান গাছের কুশি অবস্থায় পোকার আক্রমণে কুশি বা পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছ তা পুষিয়ে নিতে পারে। কৃষক এটি আমলে না নিয়েই কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকেন। এর ফলে ধান ক্ষেতে উপকারী পোকা মাকড়ের সংখ্যা কমে যায় এবং ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যায়। আবার সঠিক কীটনাশক সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার না করার ফলে বিভিন্ন পোকার পুনরাবির্ভাব (Resurgence) ঘটে। ফলে কীটনাশক ব্যবহার করার পর পোকার সংখ্যা না কমে আরও বেড়ে যায় এবং তা দমনের জন্য কৃষক কে বার বার কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়।

গবেষণা কার্যক্রম: ব্রি'র কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক 'পোকামাকড়ের পরিবেশবান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরন' কর্মসূচির আওতায় আউশ, রোপা আমন এবং বোরো মওসুমে ব্রি'র ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মাধ্যমে রংপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, সিলেট, হবিগঞ্জ, চট্রগ্রাম, যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, ফরিদপুর, সোনাগাজী, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা ও গাজীপুরসহ ১৬টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৩০০ (তিনশত) জন কৃষকের ১২৮.৩ হেক্টর জমিতে ৩০০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। সেখানে একজন কৃষকের এক একর পরিমান জমি সমান দুভাগ করে এক অংশে গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। অপর অংশে কৃষক কে তার প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে দেয়া হয় (ছবি ১)।

ছবি ১ঃ কৃষকের জমিতে প্রদর্শণী প্লট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল

গবেষকের পদ্ধতিতে ধান ক্ষেতে সুষম সারের ব্যবহার, সারি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে সঠিক বয়সের চারা রোপন, সঠিক পানি ও আগাছা ব্যবস্থাপনা এবং প্রতি ১০০ বর্গমিটারে একটি করে ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ধানের চারা রোপনের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত কোন প্রকার রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে উপকারী পোকা মাকড়ের বংশ বিস্তার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মাঠে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা হয় । ফলে বোরো মওসুমে শতকরা ১০০ ভাগ জমিতে এবং আউশ ও রোপা আমন মওসুমে শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে কীটনাশক ছাড়াই পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করে ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আউশ ও রোপা আমন মওসুমের শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে একবার মাত্র কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ধানের ফলনেরও কোন ঘাটতি হয়নি (ছবি ২)।

ছবি ২ঃ বোরো মওসুমে কৃষকের জমিতে গবেষকের পদ্ধতিতে কীটনাশক ছাড়াই পোকা দমন, নলছিটি, ঝালকাঠি

কৃষকের পদ্ধতিতে ধান চাষের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষক সারিতে চারা রোপন না করে এলোমেলোভাবে চারা রোপন করেন এবং চারা রোপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ইউরিয়া সারের প্রথম উপরি প্রয়োগের সময় ধান ক্ষেতে পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ না করেই দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে পোকা দমনের জন্য আরও ২-৩ বার কীটনাশক প্রয়োগ করেন।

গবেষণার ফলাফল: আউশ মওসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬২ জন কৃষকের জমিতে গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৪.৯৮ টন ফলন পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে কৃষকের পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৪.৫৪ টন ফলন পাওয়া গেছে। রোপা আমন মওসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৬ জন কৃষকের জমিতে গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৫.৫৪ টন ফলন পাওয়া গেছে এবং কৃষকের পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৫.০৯ টন ফলন পাওয়া গেছে। অনুরুপভাবে, বোরো মওসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭২ জন কৃষকের জমিতে গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৭.০৪ টন ফলন পাওয়া গেছে (সারণি ১)।

সারণি ১- বিভিন্ন ম্ওসুমে গবেষক্ ও কৃষকের পদ্ধতিতে উৎপাদিত ধানের গড় ফলন

ম্ওসুম	জাত	গড় ফলন (টন/হেক্টর)	
		গবেষকের পদ্ধতি	কৃষকের পদ্ধতি
আউশ	ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮৫	৪.৯৮ ± ০.১৫	৪.২৬± ০.১০
রোপা আমন	ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৮৭, ব্রি হাইব্রিডধান৪, ৬, ব্রি ধান৫১, ৫২ বি আর২৩	৫.৫৪± ০.০৬	৫.০৯± ০.০৭
বোরো	ব্রি ধান২৮, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৮,৬৩, ৭৮, ৭৯ ব্রি হাইব্রিড ধান৫	৭.০৪± ০.১৬	৬.৫৯± ০.১৭

পক্ষান্তরে, কৃষকের পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদ করে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৬.৫৯ টন ফলন পাওয়া গেছে।

উপসংহারঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৩০০ জন কৃষকের ১২৮.৩ হেক্টর জমিতে গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে ০.৫ টন ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদের তুলনায় ৬৪.১৫ টন ধানের অতিরিক্ত ফলন পাওয়া গেছে। তাছাড়া গবেষকের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় প্রতি মওসুমে কীটনাশকের ব্যবহার কমপক্ষে দুই বার করে কমেছে। অর্থাৎ কৃষক তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের সময় ২-৪ বার পর্যন্ত কীটনাশক ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে গবেষকের পদ্ধতিতে কীটনাশক ছাড়াই কিংবা একবার মাত্র কীটনাশক ব্যবহার করে ধান উপাদন করা হয়েছে। ফলে ২.৫৬ টন কীটনাশকের ব্যবহার কম হয়েছে যার বাজার মূল্য ৩,০৭,৯২০/- (তিন লক্ষ সাত হাজার নয়শত বিশ) টাকা মাত্র। ফলে ধান চাষে কীটনাশকের ব্যবহার কমেছে, কীটনাশকের বিষাক্ততা থেকে পরিবেশ রক্ষা পেয়েছে, যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রেখেছে। ধান ক্ষেতে সুষম সারের ব্যবহার, সারি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে সঠিক বয়সের চারা রোপন, সঠিক পানি ও আগাছা ব্যবস্থাপনা এবং প্রতি ১০০ বর্গমিটারে একটি করে ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করে ধানের চারা রোপনের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার না করলে উপকারী পোকা মাকড়ের বংশ বিস্তার ঘটে যা পরবর্তীতে ক্ষতিকর পোকা দমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাঠে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য নেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, ডালপালাটি পাখি বসার উপযুক্ত অর্থাৎ শক্ত ও ধান গাছের চেয়ে বেশ উঁচু হয় এবং পাখি যেন পোকা দেখতে ও ধরতে পারে (ছবি ৩)। তবে ধানের চারা লাগানোর পরে অন্যান্য পরিচর্যার পাশাপাশি কমপক্ষে প্রতি ১৫ দিন পর পর হাত জালের সাহায্যে পোকা ধরে ক্ষতিকর ও উপকারী পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কীটনাশক ব্যবহার ছাড়াই কিংবা একবার মাত্র কীটনাশক ব্যবহার করেই ধান উৎপাদন করা সম্ভব এবং এতে ফলনের কোন ঘাটতি হয় না। ফলে ধানের উৎপাদন খরচ কমে এবং এই প্রক্রিয়ায় কীটনাশকের বিষাক্ততা থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা যায় এবং বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল ঘরে তোলা যায়।

ছবি ৩ঃ ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য পোকা দমন

প্রচারে: কীটতত্ত্ব বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর